ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2291-2300
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.492

অশ্রুসিক্ত এক মহাজীবনের আখ্যান

শ্রী সুমন শর্মা, *স্বাধীন গবেষক, খাতড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.06.2026; Accepted: 27.06.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The research paper titled "**ASRUSIKTO EK MOHAJIBONER AKHYAN**" (The Tale of a Great Life Bathed in Tears) presents Rabindranath Tagore's life not merely as a world-renowned man of letters, but as an extraordinary vessel of grief and struggle. It discusses, from various perspectives, the enduring history of melancholy, the procession of deaths, and the loneliness that lay hidden behind the brilliant circle of light of the Poet Laureate's global success.
The research vividly portrays the loss of the poet's mother in his youth, the sudden tragic death of Kadambari Devi, and the subsequent loss of one close relative after another.
Alongside this personal pain, it highlights the envious criticism of contemporary society and his family's tribulations. Rabindranath did not limit this personal anguish to a state of mere sorrow; rather, he refined it through the fire of creativity, elevating it into a universal spiritual philosophy. Fundamentally, this project is a courageous attempt to uncover the solitary and sensitive essence of Tagore's life, which served as the hidden source behind his immortal creation.
Keywords: Rabindra-Life and Suffering, Saga of a Great Life, Suffering and Bereavement, Humanistic Portrait of Tagore, Bereavement and Creativity

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটি উচ্চারণের সাথে সাথেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এক ঋষিপ্রতিম বিশ্বকবির অবয়ব, যাঁর ললাটে আঁকা বিশ্বজয়ের তিলক। আমরা তাঁকে চিনি বাংলা সাহিত্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাট হিসেবে, যাঁর লেখনীতে বাংলা ভাষা সাবালক হয়েছে। এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী হিসেবে প্রাচ্যের প্রজ্ঞা দিয়ে বিশ্বকে জয় করেছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন দূরদর্শী জমিদার, নিপুণ সুরকার এবং শান্তিনিকেতনের মতো এক অনন্য বিদ্যাপীঠের স্বপ্নদ্রষ্টা। কিন্তু এই জ্যোতির্ময় সাফল্যের আলোকছটার আড়ালে চিরকাল ঢাকা পড়ে গেছে এক সীমাহীন অন্ধকারের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের জীবন ছিল আসলে শোকের এক সুদীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ পথ চলা।

সাধারণত কবির সাফল্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু তাঁর এই অনন্য সৃষ্টির নেপথ্যে ছিল ব্যক্তিগত জীবনের এক বিরাট হাহাকার। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন অতি কাছ

থেকে। কিশোর বয়সে পরম মমতাময়ী জননী সারদাসুন্দরী দেবীর প্রয়াণ থেকে শুরু করে তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক আত্মহনন রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী বারংবার কেঁপে উঠেছে প্রিয়জনের বিদায়ের কম্পনে। মধ্যবয়সে এসে তিনি হারিয়েছেন সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে, আর একে একে বিদায় নিয়েছেন তাঁর আদরের সন্তানরা। এমনকি যে সমাজ আজ তাঁকে গুরুদেবের আসনে বসিয়েছে, সেই সমাজের তৎকালীন এক বিরাট অংশ থেকে তিনি পেয়েছেন তীব্র অবজ্ঞা, অহেতুক সমালোচনা এবং ঘৃণা।

আমরা যখন তাঁর সুবিশাল ও বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি সম্ভারের দিকে তাকাই, তখন সৃষ্টির সেই উজ্জ্বলতায় কবির ব্যক্তিগত চোখের জল যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিটি অমর সৃষ্টির গভীরে মিশে আছে এক একটি নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস। এই প্রকল্পে আমরা সেই রক্ত-মাংসের রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব, যিনি ব্যক্তিগত বিষাদের দহনকে নিজের ভেতরে ধারণ করে তাকে বিশ্বজনীন শান্তিতে রূপান্তর করেছিলেন। শোকের যে আগ্নেয়গিরি তাঁর বুকে ছিল, তাকে তিনি ধ্বংসের কাজে ব্যবহার না করে সৃজনের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। এই লেখা কবিগুরুর নিভৃত জীবন এবং তাঁর শোকতপ্ত হৃদয়ের এক সংবেদনশীল অনুসন্ধান।

কবি লিখেছেন:

> "আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
> আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।"[১]

এই লেখার মাধ্যমে আমরা সেই রবীন্দ্রনাথকে জানব, যিনি ব্যক্তিগত বিষাদের দহনকে বিশ্বজনীন শান্তিতে রূপান্তর করেছিলেন।

শৈশব ও কৈশোরের দহন:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের প্রথম ভাগটি বাইরের চাকচিক্যে রাজকীয় মনে হলেও অন্দরের বাস্তব ছিল বড়ই রূঢ় এবং নিঃসঙ্গ। তাঁর দুঃখের অভিষেক ঘটেছিল অত্যন্ত অল্প বয়সে, জীবনের মর্ম বোঝার আগেই তিনি শোকের নিষ্ঠুর রূপের মুখোমুখি হন।

❖ **মাতৃহারা বালক ও ভৃত্যরাজকীয় শাসন:**

১৮৭৫ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ বছর। সেই কিশোর বয়সেই তিনি তাঁর স্নেহময়ী মা সারদা দেবীকে হারান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিশাল অন্দরমহলে বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের ভিড়ে বালক রবি ছিলেন একলা এক পথিক। তখনকার দিনে ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানদের লালন-পালন হতো ভৃত্যদের কড়া শাসনে। মা সারদা দেবী অসুস্থতার কারণে শেষ দিনগুলোতে সন্তানদের থেকে কিছুটা দূরে থাকতেন। তাই মায়ের মৃত্যু সংবাদটি যখন এলো তখন বালক রবির কাছে সেটি কেবল একটি সংবাদ নয়, বরং এক বিশাল শূন্যতার হাহাকার হয়ে ধরা দিল। তিনি পরবর্তীকালে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছিলেন:

> "বাড়ির ভিতরে যখন মায়ের মৃত্যুসংবাদ এল, আমি তখন ঘুমিয়েছিলুম। ঘুম ভাঙলে যখন শুনলুম মা নেই, তখন সেই কথাটার মানে আমি ভাল করে বুঝতেই পারলুম না।"[২]

মায়ের দেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বালক রবি ভোরের আবছায়ায় সেই শোকযাত্রার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শ্মশান যাত্রীদের ফিরে আসার পর যখন কবি মায়ের শূন্য ঘরে ঢুকলেন, তখন সেই নীরবতা কবিকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে জীবনের বড় একটি অবলম্বন তিনি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছেন।

❖ নিঃসঙ্গ কিশোরের ধ্রুবতারা:

মায়ের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক চিলতে রোদ্দুর হয়ে এসেছিলেন তাঁর মেজদাদা জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। সম্পর্কে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'নতুন বৌঠান'। বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড় কাদম্বরী দেবী। ঠাকুরবাড়ির এই নিঃসঙ্গ কিশোরের কাছে ছিলেন খেলার সঙ্গী, সাহিত্যচর্চার অনুপ্রেরণা এবং তাঁর একান্ত আপনজন। ঠাকুরবাড়ির কঠোর অনুশাসনের বাইরে তাঁরা দুজন মিলে এক আলাদা স্বপ্নের জগৎ তৈরি করেছিলেন। চিলেকোঠায় বসে কবিতা পড়া, নতুন নতুন গানের সুর দেওয়া— সবকিছুর কেন্দ্রে ছিলেন এই মহীয়সী নারী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনি। কবি তাঁকে আড়ালে ডাকতেন 'হেঁলি' বলে। কাদম্বরী দেবীই ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি কিশোর রবির ভেতরের সুপ্ত কবিসত্তাকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাকে ক্রমাগত উৎসাহিত করেছিলেন।

❖ ১৮৮৪ একটি নক্ষত্রের পতন এবং চিরস্থায়ী দহন:

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে গভীর এবং যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতটি তৈরি হয় ১৮৮৪ সালে। কবির বয়স তখন মাত্র তেইশ। মাত্র চার মাস আগে কবি মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হঠাতই বজ্রপাতের মতো এক সংবাদ এল— নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর এই অকাল প্রস্থান পুরো ঠাকুরবাড়িতে শোকের কালো ছায়া ফেলে দেয়।

কবির কাছে এই মৃত্যু ছিল জীবন ও জগতের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এক বিভীষিকা। কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন, তা আজও ইতিহাসের এক অমীমাংসিত রহস্য। কিন্তু এই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে আমূল বদলে দিয়েছিল। যে মানুষটি ছিল তাঁর সৃজনশীলতার মূল উৎস, যাঁর হাতে প্রথম লেখা কবিতা তুলে দিতেন, তাঁর চিরবিদায় কবিকে জীবনের এক নিগূঢ় রহস্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কবি লিখেছিলেন:

> "সেই প্রথম পরিচিত মৃত্যু আমার জীবনের সমস্ত আকাশটাকে কালো করে দিল। চারিদিকের গাছপালা মাটি জল এবং নীল আকাশটা যেন হঠাৎ মস্ত একটা 'না' হয়ে উঠল।"[৩]

❖ সাহিত্যে কাদম্বরী দেবীর ছায়া:

এই শোক রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। তিনি কোনোদিন এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর পরবর্তী জীবনের অজস্র নারী চরিত্রের মধ্যে— তা সে 'নষ্টনীড়'-এর চারুলতা হোক বা 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা— সবকিছুর মধ্যেই গবেষকরা কাদম্বরী দেবীর সেই বিষাদমাখা আয়ত চোখের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি' গদ্যে তিনি এই শোকের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পড়লে আজও পাঠকের চোখে জল আসে। তিনি সেখানে লিখছেন—

> "কোথায় গেল সেই হাস্যময়ী ছায়াটি? কোথায় গেল সেই স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর?"[৪]

কবির বিখ্যাত গান 'কে তুমি বসিয়ে বিপিনমাঝে' বা 'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়'— এসবের নেপথ্যে ছিল সেই হারানো সুহৃদের স্মৃতি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মৃত্যু কেবল মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় না, বরং চিরকালের মতো সেই চেনা জগতটাকেও পাল্টে দেয়। শৈশব থেকে কৈশোরের এই মাতৃহানি এবং প্রাণাধিক প্রিয় বৌঠানের প্রস্থানই রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালের মহাকবি হওয়ার পথে দুঃখের

আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করে তুলেছিল। তাঁর সাহিত্যের যে গাম্ভীর্য ও করুণ রস, তার বীজ বপন হয়েছিল এই কৈশোরের শ্মশানেই।

মৃত্যুর মিছিল: (১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল):

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের মধ্যগগন যখন সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার কথা, ঠিক তখনই নিয়তি তাঁর ওপর ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম আঘাতগুলো হানতে শুরু করে। ১৯০২ থেকে ১৯০৭— এই মাত্র পাঁচটি বছর ছিল কবির জীবনের এক ভয়াবহ কালখণ্ড। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে তিনি তাঁর সংসারের চারজন নিকটতম এবং প্রিয়তম মানুষকে হারান। একের পর এক প্রিয়জনের চিতাভস্মে কবির গৃহকোণ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এই সময়কালকে রবীন্দ্র-জীবনীকারগণ 'বিষাদ সিন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন।

❖ জীবনসঙ্গিনীর চিরবিদায় (মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ১৯০২):

১৯০২ সালের ২৩ নভেম্বর। মাত্র ২৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ৪১ বছরের এক পূর্ণ যুবক। মৃণালিনী দেবী কেবল তাঁর পত্নী ছিলেন না, ছিলেন কবির শান্তিনিকেতন আশ্রমের নেপথ্যের প্রধান শক্তি। স্ত্রীর অসুস্থতার সময় কবি নিজে রোগীর শিয়রে বসে সেবা করেছেন, পাখা টেনেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারেনি।

স্ত্রীর মৃত্যুতে কবি এক গভীর নিঃশব্দ শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। কথিত আছে, স্ত্রীর মৃত্যুর রাতে কবি কাউকে বুঝতে দেননি তাঁর হৃদয়ের দহন। কিন্তু গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, তখন কবি শান্তিনিকেতনের 'দেহলি' বাড়ির ছাদে একা পায়চারি করতেন। তাঁর এই নিঃশব্দ কান্নার ফসল হলো **'স্মরণ'** কাব্যগ্রন্থ। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

> "যে রাত্রে সে গেল চলি সে রাত্রেও ছিল এই চাঁদ, এই আলো, এই মৃতুয-মাঝে জীবনের অগাধ আস্বাদ।"[৫]

যিনি সারা জীবন অন্যের দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন, আজ তাঁর নিজের ঘরেই নেমে এল চিরস্থায়ী নিঃসঙ্গতা।

❖ পিতার এক ব্যর্থ লড়াই (কন্যা রেণুকা মৃত্যু ১৯০৩):

স্ত্রীর শোকের রেশ কাটতে না কাটতেই মাত্র ৯ মাসের মাথায় কবির মেজ মেয়ে রেণুকা (যাঁকে কবি আদর করে 'রানী' ডাকতেন) কঠিন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। মা-হারা মেয়েকে বাঁচানোর জন্য কবি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রেণুকাকে নিয়ে হাজারিবাগ থেকে শুরু করে আলমোড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছেন বিশুদ্ধ বাতাসের আশায়। আধুনিক চিকিৎসা আর পিতার অদম্য ভালোবাসা—কোনো কিছুই নিয়তিকে রুখতে পারেনি। ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরে মাত্র ১৩ বছর বয়সে রেণুকা বাবার কোল শূন্য করে চলে যান। এক বছরের ব্যবধানে স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু কবিকে এক চরম শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু কবির পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি।

❖ ছায়া হারানো বটগাছ (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু ১৯০৫):

১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন রবীন্দ্রনাথের পরম শ্রদ্ধেয় পিতা এবং জীবনের পথপ্রদর্শক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার মূল উৎস। যদিও তিনি বৃদ্ধ বয়সে মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর পিতার প্রস্থান ছিল মাথার ওপর থেকে এক বিশাল বটগাছের ছায়া সরে যাওয়ার মতো। শৈশব থেকে যাঁকে আদর্শ মেনে বড় হয়েছেন, সেই পিতার প্রস্থান

কবিকে মানসিকভাবে আরও একা করে দেয়। পারিবারিক ঐতিহ্যের যে গুরুভার মহর্ষি বহন করতেন, তা এখন পুরোপুরি কবির ওপর এসে পড়ে। কবি লিখেছিলেন— তাঁর পিতার মৃত্যু তাঁকে শোকাতুর করার চেয়েও বেশি করে জীবনের বৃহত্তর কর্তব্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

❖ কবির জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি (শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭):

এই পাঁচ বছরের বিষাদ সিন্ধুর শেষ এবং সবচেয়ে মরণঘাতী ঢেউটি ছিল কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ১৯০৭ সালে মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে মাত্র ১২ বছর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় শমী। শমী ছিল হুবহু কবির মতো দেখতে— শান্ত, ধীরস্থির এবং অসম্ভব মেধাবী। কবির ভাষায় শমী ছিল তাঁর "ছোট্ট বন্ধু"। পুত্রের এই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে ভেতর থেকে চুরমার করে দিয়েছিল। কথিত আছে, শমীকে শ্মশানে দিয়ে আসার পর কবি যখন মুঙ্গের থেকে ট্রেনে ফিরছিলেন, তখন কামরার এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন— চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই। কবি পরে লিখেছিলেন, বাড়ির সেই অসীম শূন্যতায় তাঁর মনে হয়েছিল মহাকাশ যেন ফেটে পড়ছে। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন—

> "শমীর মৃত্যুর পর সারা রাত একা বসে থেকেছি, মনে হয়েছে মহাকাশ আজ তার সব আলো নিয়ে আমার শূন্য ঘরে প্রবেশ করেছে।"[৬]

পুত্রের মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণা কবিকে আধ্যাত্মিকতার এক নতুন স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। এই দহন থেকেই জন্ম নিয়েছিল **'খেয়া'** এবং পরে **'গীতাঞ্জলি'**-র সেই অমোঘ সুর। তিনি শোককে গিলে ফেলে বলতে পেরেছিলেন—

> "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
> তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ, তবুও অনন্ত জাগে॥"[৭]

পারিবারিক বিড়ম্বনা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সন্তানদের সুখী দেখতে নিজের জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, তিনি তাঁর জামাতাদের কাছ থেকে বিনিময়ে পেয়েছেন কেবল অবহেলা, আর্থিক শোষণ এবং চরম মানসিক যন্ত্রণা। এক বিশ্ববরেণ্য পিতার সামনে তাঁর কন্যাদের ধুঁকে ধুঁকে মরা এবং জামাতাদের উদ্ধত আচরণ কবির জীবনকে বিষাদময় করে তুলেছিল।

❖ বড় মেয়ে বেলা (মাধুরীলতা) ও শরৎকুমারের নিষ্ঠুরতা:

কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা ছিলেন তাঁর অত্যন্ত আদরের। ১৯১৮ সালে বেলা যখন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাতান্ন। প্রতিদিন কবি জোড়াসাঁকো থেকে বেলার শ্বশুরবাড়িতে যেতেন মেয়েকে দেখতে। কিন্তু বেলার স্বামী শরৎকুমার ছিলেন এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। কবি যখন মেয়ের শিয়রে বসতেন, শরৎকুমার তখন পাশের ঘরে উচ্চস্বরে বিদ্রূপ করতেন বা কবির সামনেই টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে অভদ্রভাবে সিগারেট খেতেন। শরৎকুমারের ব্যবহারে অপমানিত হয়ে কবি অনেক সময় মেয়ের ঘর থেকে চোখের জল নিয়ে বেরিয়ে আসতেন। বেলার মৃত্যুর দিন কবি যখন তাঁকে দেখতে যাচ্ছিলেন, মাঝপথে খবর পেলেন বেলা আর নেই। জামাতার রূঢ় আচরণের ভয়ে কবি শেষবারের মতো মেয়ের মুখটি দেখতে বেলার শ্বশুরবাড়িতে ঢোকেননি; মাঝপথ থেকেই রিকশা ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। সেই রাতে কবির নীরবতা ছিল শ্মশানের মতো ভয়াবহ।

❖ **ছোট মেয়ে মীরা ও নগেন্দ্রনাথের বিশ্বাসঘাতকতা:**

কবির ছোট মেয়ে মীরার জীবন ছিল আরও যন্ত্রণাদায়ক। মীরার স্বামী নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে উচ্চশিক্ষিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারির আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ করতে তিনি তাঁকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ছিলেন এক উদ্ধত ও অস্থির প্রকৃতির মানুষ। তিনি মীরার সাথে কেবল খারাপ ব্যবহারই করেননি, বরং কবির অর্থ অপচয় করে শেষ পর্যন্ত মীরাকে ত্যাগ করে চলে যান। নিজের চোখের সামনে মেয়ের সংসার ভেঙে যাওয়া এবং জামাতার এমন অকৃতজ্ঞতা বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিল। তিনি মীরাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেতেন না, কেবল নিজের ডায়েরিতে লিখতেন সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা।

সামাজিক নিগ্রহ:

আমরা ভাবি যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বোধহয় বাঙালির পরম পূজনীয় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস বলছে অন্য কথা। তাঁর নিজের দেশের মানুষই তাঁকে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত করেছে।

❖ **নোবেল পুরস্কার ও 'চুরির' অপবাদ:**

১৯১৩ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেলেন, তখন বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলের একটি বড় অংশ ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছিল। অনেক সংবাদপত্রে তখন দাবি করা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ 'লবিং' করে বা ইংরেজদের তোষামোদ করে এই পুরস্কার পেয়েছেন। এমনকি অনেকে এই গুজবও ছড়িয়েছিলেন যে, তিনি ইয়েটসের লেখা চুরি করে খ্যাতি পেয়েছেন। শান্তিনিকেতনে যখন নাগরিক সংবর্ধনা দিতে একদল মানুষ উপস্থিত হলেন, কবি তাঁদের মুখের ওপর বলেছিলেন—

"আজ আপনারা যে মদ্য পরিবেশন করেছেন, তা আমি পান করতে পারব না। কারণ এই মদ্য বিষে ভরা।" যাঁরা আগে তাঁকে গালি দিতেন, নোবেলের লোভে তাঁরাই অভিনন্দন জানাতে আসায় কবি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

❖ **ওকাম্পো ও ব্যক্তিগত জীবনে কুৎসা:**

আর্জেন্টিনার বিদুষী লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে রবীন্দ্রনাথের একটি গভীর আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওকাম্পো কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে 'বিজয়া' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু বাংলার সমাজ এই পবিত্র সম্পর্ককে কলঙ্কিত করতে ছাড়েনি। সেই সময়ের বিভিন্ন নামী সাময়িকী ও সংবাদপত্রে কবিকে নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিকর ব্যঙ্গচিত্র ও নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। বৃদ্ধ বয়সে এসেও তাঁকে এমন নোংরা চরিত্রহননের শিকার হতে হয়েছিল, যা তাঁর মতো সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে সহ্য করা ছিল দুঃসাধ্য।

❖ **সমকালীন সাহিত্যিকদের অবজ্ঞা:**

সমকালীন অনেক সাহিত্যিক তাঁকে 'অস্পষ্ট' বা 'আধুনিকতা বিরোধী' বলে আক্রমণ করতেন। শান্তি নিকেতনে কবির সাথে দেখা করতে এসে অনেকে তাচ্ছিল্যের সুরে বলতেন, "রবিবাবু, টাকা তো অনেক পেলেন, এখন কি আর নতুন কিছু লিখতে পারছেন?" এই যে ঘরের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া অবজ্ঞা, এটি কবিকে বিদেশের মাটিতে পাওয়া সম্মানের চেয়েও বেশি পুড়িয়েছিল। কবি বুঝেছিলেন, তাঁর নিজের জাতিই তাঁকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।"[৮]

বিশ্বভারতী ও কবির নিঃস্ব জীবন:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ দুই দশক ছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার এক সুকঠিন সংগ্রামের ইতিহাস। আমরা আজ যে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীকে দেখি, তার প্রতিটি ইটের স্তরে মিশে আছে কবির ব্যক্তিগত ত্যাগ, দীর্ঘশ্বাস এবং চরম আর্থিক কৃচ্ছ্রসাধন। যিনি ছিলেন একজন জমিদার এবং বিশ্ববিখ্যাত নোবেলজয়ী, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছিল প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়।

❖ নোবেল পুরস্কারের অর্থ ও ত্যাগের মহিমা:

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন, তখন সেই সময়ে তাঁর পাওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল অনেক। সাধারণ মানুষ মনে করতে পারেন, সেই অর্থ দিয়ে তিনি হয়তো নিজের অভাব মেটাবেন বা মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর মানুষ। তিনি নোবেল পুরস্কারের একটি পয়সাও নিজের বা নিজের পরিবারের সুখের জন্য ব্যয় করেননি। সেই পুরো অর্থ তিনি দান করে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর উন্নয়ন এবং পতিসরের কৃষকদের জন্য স্থাপিত কৃষি ব্যাংকের মূলধন হিসেবে। নিজের রক্ত জল করা অর্জিত খ্যাতিকে তিনি মানবতার সেবায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

❖ শান্তিনিকেতনের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা:

বিশ্বভারতীকে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে কবিকে চরম অর্থসংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া এবং আশ্রমের খরচ মেটানোর জন্য বৃদ্ধ বয়সেও কবিকে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। জীবনের শেষ দিকে শরীর যখন অত্যন্ত রুগ্ন, তখনও তিনি নিজের লেখা নাটকের দল নিয়ে বিভিন্ন শহরে অভিনয় করে বেড়াতেন— উদ্দেশ্য ছিল নাটক দেখিয়ে যে সামান্য অর্থ সংগৃহীত হবে, তা দিয়ে বিশ্বভারতীর ঋণের বোঝা হালকা করা। মহাত্মা গান্ধী যখন কবির এই করুণ অবস্থা দেখেছিলেন, তখন তিনি ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, "ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিকে অর্থের জন্য এভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে দেখা এক জাতীয় লজ্জা।" পরবর্তীকালে গান্ধীজির উদ্যোগেই কিছু অনুদান আসে, যা কবিকে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল।

❖ ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা:

কবির ব্যক্তিগত জীবনের ডায়েরিগুলো পড়লে জানা যায়, তিনি নিজের জামাতাদের বিদেশে পড়াশোনার খরচ জোগাতে গিয়ে নিজের জমিদারির গয়না থেকে শুরু করে দুষ্প্রাপ্য বই পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিলেন। জামাতা নগেন্দ্রনাথের উচ্চবিলাসের যোগান দিতে গিয়ে কবিকে বারবার ঋণের জালে জড়াতে হয়েছে। অথচ বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন কেবল অবহেলা। জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন তিনি রোগশয্যায়, তখনও তাঁর মাথায় ছিল বিশ্বভারতীর ঋণ আর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের ভবিষতের চিন্তা। কবি সারা জীবন পরের জন্য সেচখাল কাটলেন, পরের তৃষ্ণা মেটালেন, অথচ নিজের জীবনের মরুভূমিতে এক ফোঁটা জল দেওয়ার মতো কেউ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের এই নিঃস্বতা ছিল এক মহান নিঃস্বতা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রকৃত সম্রাট তিনি নন যার অনেক ধনসম্পদ আছে, বরং তিনিই সম্রাট যিনি নিঃস্ব হয়েও বিশ্বকে অকাতরে দান করতে পারেন। তাঁর এই ত্যাগের কথা মনে রেখেই হয়তো তিনি লিখেছিলেন—

"তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে"।"[৯]

রবীন্দ্রদর্শন:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শন ছিল এক মহাসমুদ্রের মতো গভীর, যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একের পর এক শোকের অভিঘাতে আরও শাণিত ও পরিণত হয়েছিল। তিনি এমন এক জীবনবোধের কথা বলেছিলেন যেখানে দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, বরং তাকে আলিঙ্গন করে অতিক্রম করার শক্তি অর্জন করা যায়। তাঁর দর্শনের মূল স্তম্ভগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

❖ **সত্যের সহজ স্বীকারোক্তি:**

কবির 'বোঝাপড়া' কবিতার সেই অমর পঙক্তি— "মনেরে আজ কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যরে লও সহজে"[১০]— এটি কেবল একটি কাব্যিক লাইন নয়, এটি ছিল তাঁর বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। কবির কাছে 'সত্য' মানে হলো 'বাস্তব'। জীবনে মৃত্যু আসবে, বিচ্ছেদ আসবে, অপমান আসবে— এগুলোই ধ্রুব সত্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমরা যখন কোনো মন্দ বা শোককে অস্বীকার করি বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি, তখন আমাদের কষ্ট বাড়ে। কিন্তু যখন আমরা তাকে সহজভাবে জীবনেরই একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করি, তখন মনের সব ভার নেমে যায়। সত্য কঠিন হতে পারে, কিন্তু সেই কঠিনকেই ভালোবাসা হলো প্রকৃত রবীন্দ্রদর্শন।

❖ **দুঃখের মধ্য দিয়ে আনন্দের অভিসার:**

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, কেবল সুখের নাম জীবন নয়। প্রকৃত আনন্দ লুকিয়ে আছে দুঃখের দহনকে সহ্য করার ক্ষমতার মধ্যে। তিনি মনে করতেন, আগুনের শিখা যেমন সোনাকে খাঁটি করে, দুঃখের আগুনও তেমনি মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ করে। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ, তবুও অনন্ত জাগে॥"[১১]

এই যে দুঃখের মধ্যে দাঁড়িয়েও জীবনের প্রতি অবিচল আস্থা রাখা, এটাই রবীন্দ্র-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর দর্শনে মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, বরং এক জীবন থেকে অন্য জীবনে যাত্রার একটি দ্বার মাত্র।

❖ **নিরাসক্ত কর্মযোগ ও ত্যাগের মহিমা:**

রবীন্দ্রনাথের দর্শনের অন্যতম দিক হলো কর্মের মধ্য দিয়ে মুক্তি। তিনি উপনিষদের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন— "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা", অর্থাৎ ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ করো। নিজের জীবনে তিনি স্ত্রী, সন্তান ও স্বজনদের হারিয়েছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিগত শোককে তিনি আটকে রাখেননি। তিনি তাঁর সমস্ত যন্ত্রণাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর মতো মহৎ সৃষ্টির মাঝে। তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজের স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর জগতের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই হলো জীবনের সার্থকতা। তাঁর মতে, শোকাতুর হয়ে বসে থাকা নয়, বরং মানুষের কল্যাণে কাজ করাই হলো শোক জয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।

❖ **প্রকৃতি ও মানবের একাত্মতা:**

রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মানুষ এবং প্রকৃতি অভিন্ন। যখন তিনি একা বোধ করতেন, তখন তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন আকাশের নীলিমায় বা বর্ষার অঝোর ধারায়। তিনি মনে করতেন, বিশ্বপ্রকৃতি হলো পরমাত্মার প্রকাশ। তাই প্রিয়জনের মৃত্যুতে যখন তাঁর ঘর শূন্য হয়ে যেত, তিনি সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করতেন প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যে। তাঁর কাছে মৃত্যু মানে লয় নয়, বরং বিশ্বচরাচরের বিশাল প্রাণপ্রবাহের সাথে মিশে যাওয়া।

❖ আধ্যাত্মিক উত্তরণ ও ঈশ্বর চেতনা:

কবির ঈশ্বর কোনো মূর্তিতে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর ঈশ্বর ছিলেন মানুষের মধ্যেই— 'জীবনদেবতা'। জীবনের চরমতম সঙ্কটে তিনি এই জীবনদেবতার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেননি। 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতিমাল্য'— তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এক সমর্পিত চিত্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে হাত দিয়ে ঈশ্বর দুঃখ দেন, সেই হাত দিয়েই তিনি সান্ত্বনা দেন। এই অটল বিশ্বাসই তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অজেয় করে রেখেছিল।

শোকোত্তীর্ণ এক মহাজীবনের জয়গান:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল একটি নাম নয়, তিনি ছিলেন এক অজেয় এবং অক্ষয় আত্মশক্তির জীবন্ত রূপক। তাঁর জীবন ছিল একাধারে সাফল্যের শিখর ছোঁয়া আর অন্যদিকে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির এক অতলান্ত অন্ধকার। আমরা যখন তাঁর সৃষ্টিসম্ভার— অজস্র কবিতা, গান আর উপন্যাসের দিকে তাকাই, তখন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাঁর প্রতিভার জ্যোতিতে। কিন্তু সেই জ্যোতির অন্তরালে লুকিয়ে ছিল এক সীমাহীন দহনের ইতিহাস।

শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত মৃত্যু যেন তাঁর ছায়ার মতো সঙ্গী হয়েছিল। তেরো বছর বয়সে মাতৃহারা হওয়া থেকে শুরু করে যৌবনে প্রিয়তমা নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা, মধ্যবয়সে মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, কন্যা রেণুকা, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু— এতগুলো আঘাত যেকোনো সাধারণ মানুষকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কেবল আপনজনদের মৃত্যু নয়, সামাজিক লাঞ্ছনা, সমসাময়িকদের বিদ্রূপ এবং নিজের কন্যা ও জামাতাদের পক্ষ থেকে পাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা কবির হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য। পৃথিবীর কোনো শোক বা কোনো বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁকে দমিত করতে পারেনি। বরং প্রতিটি আঘাত তাঁর লেখনীকে আরও শাণিত করেছে। যখনই তিনি কোনো প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তখনই তিনি সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করেছেন এক একটি অমর সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর প্রতিটি গানের কলির পেছনে লুকিয়ে আছে কবির একান্ত ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাস এবং নিভৃত রক্তক্ষরণ। তিনি তাঁর নিজের চোখের জলকে কালিতে রূপান্তর করে বিশ্বসাহিত্যের পাতায় লিখে গেছেন মানুষের চিরন্তন পাওয়া আর হারাবার গল্প।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের এক পরম সত্য শিখিয়ে গেছেন— জীবন মানে কেবল আলোকোজ্জ্বল সুখের উৎসব নয়; জীবন হলো অন্ধকারকে অতিক্রম করে আলোর পথে যাওয়ার এক সুকঠিন ও নিরন্তর সাধনা। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টির পতাকা ওড়ানো যায়। যখন শোকের মেঘে চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে, তখন কবির সেই অমর বাণীই আমাদের অন্ধকার পথের শেষ পাথেয় হিসেবে ধ্রুবতারার মতো জ্বলে ওঠে:

"মনেরে আজ কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যরে লও সহজে।"[১২]

এই একটি পঙক্তির মধ্যেই মিশে আছে জীবনের প্রকৃত সারমর্ম। পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে হোক বা না হোক, যা বাস্তব তাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া এবং সেই সত্যকে আলিঙ্গন করে সাহসের সাথে এগিয়ে চলাই হলো জীবনের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শন আমাদের শেখায় যে, মৃত্যুকে জয় করার

একমাত্র উপায় হলো জীবনের জয়গান গাওয়া এবং সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করার অসীম ক্ষমতা অর্জন করা। তাঁর এই অশ্রুসিক্ত মহাজীবন যুগ যুগ ধরে আর্তমানবতাকে শোক কাটিয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, গান সংখ্যা: ২২৩, পৃ. ৯৮।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫১–১৫২।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৫।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তদশ খণ্ড), চতুর্থ অংশ (পুষ্পাঞ্জলি- ৪), (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬৩।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৫–১৮৬।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র (ষষ্ঠ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ২৬৪।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, গান সংখ্যা: ২৪৮, পৃ. ১০৮।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘বঙ্গমাতা’, সঞ্চয়িতা। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ২৮৪-২৮৫।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, গান সংখ্যা: ৪৯২, পৃ. ১৯৩-১৯৪।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. ‘বোঝাপড়া’, ক্ষণিকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, গান সংখ্যা: ২৪৮, পৃ. ১০৮।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘বোঝাপড়া’, ক্ষণিকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দেব, চিত্রা। ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।
২. পাল, প্রশান্তকুমার। ‘রবিজীবনী’ (১ম-৯ম খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২–২০০৩, কলকাতা।
৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। ‘রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক’ (২য় খণ্ড)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৮৫–১৯৯৪, কলকাতা।
৪. রায়, নীহাররঞ্জন। ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা’ (১ম খণ্ড)। নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫২, কলকাতা।